১

কলকাতা ছাড়ছি—

বেলা চারটের সময় ট্রেন। সকালবেলা খুব দেরি করে ঘুমের থেকে উঠলাম। আজ কারুর কাছে যেতে হবে না—কোনও চাকরি খুঁজতে হবে না—কোথাও গিয়ে ঘোরাঘুরি করবার দরকার নেই আর।

বিছানায় বসে একটা কথা শুধু ভাবছিলাম : এই কলকাতায় কবে আবার ফিরে আসি, কে জানে : ডায়োসেশন কলেজের সেই মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে পারতাম—

মেয়েটি, অবিশ্যি অপরিচিতা নয়; ছ-বছর ধরে তার সঙ্গে চেনাশোনা কথাবার্তা চিঠিপত্র আলাপ—তারপর দু-বছর ধরে দু-জনের মুখ বন্ধ।

এই একই কলকাতা শহরের দুই প্রান্তে দুই জনে আছি—অথচ সে যদি পিকাডিলিতে থাকত, আর আমি থাকতাম দক্ষিণ আফ্রিকায়, তা হলেও দু-জনের মধ্যে ব্যবধান এর চেয়ে বেশি হত না।

মাঝে-মাঝে দু-একখানা কার্ড প্রত্যাশা করেছি বটে।—যদি-বা মুদ্রাদোষে সে লিখে ফেলে। লিখে ফেললে মন্দ হত না; দু-জনের ভিতর আবার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারত। কিন্তু, আমিও খুব সংযমের পরিচয় দিয়েছি। এ দু-বছরের ভিতর আমিও একখানা কার্ড অব্দি লিখতে যাইনি তাকে।

এর ভিতর বেশ একটা মর্যাদা আছে—ভালোবাসা নিয়ে খেলা করার চেয়ে এই মর্যাদাকে সর্বাঙ্গীণ করে তোলা ঢের শক্ত—হয়তো এর পরিতৃপ্তিও ঢের গভীর।

কিন্তু, আজ তবু, বনলতাকে একখানা চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছিল।

লিখলে আজই সে পাবে; তারপর উত্তরের জন্য দু-এক দিন অপেক্ষা করা যায়—

এ-রকম কত উত্তর সে দিয়েছে—সেই সবেরই ফিরে-ফিরতি শুধু—তারপর বোর্ডিঙে গিয়ে স্লেটে নাম লিখে দিলে বনলতা নীচে নেমে আসবে—তারপর দু-এক ঘণ্টার কথাবার্তা। জীবনে এমন অনেক কথাবার্তা আমাদের দু-জনের মধ্যে হয়েছে।

তারপর মনে হয়েছিল, কথা বলবার আর কোনও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু, তবুও, দেখতে ইচ্ছে করছে আজ আবার।

একখানা কার্ড লিখে দিলেই সব সম্ভবত হয়; আমি জানি তা। কিন্তু, বনলতাও তো আমাকে লিখতে পারত। সে-ই-বা লিখল না কেন?

আমিও লিখতে গেলাম না আজ আর।

কয়েক দিন আগে খুব বেশি রাত করে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম যে, বনলতা আর আমি পরস্পরে পরস্পরের ভুল ভাঙাতে চেষ্টা করছি—বলছি : জীবন ক-দিনেরই বা! মিছেমিছি এমন মুখ ফিরিয়ে থাকা কেন আর? তারপর দু-জনে মিলিত হতে যাচ্ছিলাম—

কিন্তু স্বপ্ন গেল ভেঙে—

জেগে উঠে বুঝলাম, মানুষের দৈনন্দিন জীবনটা একটা মস্ত বড়ো ঠাট্টার গিটকিরি শুধু—সে-পৃথিবীতে বেঁচে থাকাও যেন অসম্ভব।

কিন্তু, তবুও, বাঁচলাম তো।

আজও বাঁচা।

দেশে যেতে টিকিটে গোটা চারেক টাকা খরচ লাগবে; আর কয়েকটা টাকা আছে। একটা চায়ের দোকানে গিয়ে টোস্ট ডিমভাজা কেক খাওয়া গেল—একটা চুরুট নিলাম—গোটা তিনেক ইংরেজি খবরের-কাগজ নিজের পয়সায় কিনে পড়লাম; বিলাস ও ব্যসন বলতে এই সবই বুঝি আমি—সে-সবের চূড়ান্তও হয়ে গেল।

তিন-চারটা চুরুট নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

হাতে আর কোনও কাজ নেই।

একটা চুরুট জ্বালিয়ে কলেজ স্ট্রিট, শ্যামাচরণ দে-র স্ট্রিট, শ্রীগোপাল মল্লিকয়ের লেন, কলেজ স্কোয়ার, হ্যারিসন রোড—ফের কলেজ স্ট্রিটে ঘুরতে লাগলাম—কারু সঙ্গে দেখা হয় কি-না।

কিন্তু, পথ-ঘাট ছেড়ে সে-সব লোক চলে গিয়েছে—যাদের চাচ্ছি, তাদের একজনও নেই।

বইয়ের দোকানগুলো বড্ড লোভের জিনিস : কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বিরাট স্তূপ বাইরের থেকেই দেখা যায়—কিন্তু, একখানা বইয়েও হাত দেবার জো নেই। যারা মাসে পাঁচশো থেকে পাঁচ-হাজার টাকা অব্দি সুদ পাচ্ছে, তারাও, অবিশ্যি, এ-সব কেনে না; কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, কিনবার শক্তি তাদেরই—এবং তাদের ছেলেমেয়েরাই কেনে, পড়ে, উপভোগ করে;—আমি, যার বড়োমানুষি ন-মাস ছ-মাসে একটা ডবল অমলেট ও এক গ্লাস আইসক্রিমে, এ-সব বড়োমানুষির শক্তি আমার নেই।

আনাতোল ফ্রাঁসয়ের কয়েকখানা বই কিনেছিলাম এক সময়ে; আরও কয়েকখানা কিনবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু, এই দু-বছরের ভিতর নানা রকম ত্যাগ স্বীকার করেও তা পারলাম না।

বই কিনতে হলে একটা চাকরি পাওয়া দরকার। পঁচিশ টাকার টুইশন করে মেসে থাকা ও বই কেনা সম্ভব নয়; অন্তত, আমি তা পারি না। আজও হয়তো আমি একটু রাজসিক—

আজকালকার বাঙালি ছেলেরা অলডাস হাক্সলি-র বই খুব পড়ে—কারু কাছে ধরে- করেও জোগাড় করে উঠতে পারিনি।

একটা দোকানে ঢুকে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—হাক্সলি-র এই বইয়ের দাম কত?

—তিন শিলিং ছ পেন্স।

—তাঁর সবচেয়ে ভালো বই কোনটা?

—*ব্রেভ নিউ ওয়র্ল্ড*।

হ্যাটকোট-পরা একজন ভদ্রলোক দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললে—অত্যন্ত ওঁচা বই—

আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

তিন শিলিং ছ পেন্সে বই কেনা চলে না—শেয়ালদা স্টেশনে হুইলারয়ের স্টলে দশ- বারো আনায় বই পাওয়া যাবে। হাক্সলি-র তুলনায় সে-সব বই, অবিশ্যি, কিছুই নয়। কিন্তু, আমার হ্যামলেট কিং-লিয়ারও পড়া আছে তো—বুঝে নেব যে, হাক্সলি-র বইগুলো এই দু-রকম জিনিসের মাঝখানে দোআঁশলা একটা কিছু।

কিন্তু, তবুও, লরেন্স ও হাক্সলি-র বইগুলো একদিন কিনতেই হবে—এরা হয়তো তখন এ-বইগুলো সেকেন্ড হ্যান্ডে বিক্রি করবে—

ওল্ডবুক শপে আজকাল নুট হামসুন সেকেন্ড হ্যান্ডে পাওয়া যায়—

কিন্তু, নুট হামসুন কে পড়ে আজকাল আর? আমিও না।

বইয়ের দোকান থেকে নেমে কলেজ স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছিলাম—ভিড়ের ভিতর থেকে যতীন আমার ঘাড়ে হাত রাখল—

যতীনের হাতে কাগজপত্রের একটা মস্ত বড়ো প্যাকেট—

—এগুলো কী নিচ্ছ, যতীন?

—প্রুফ—

—প্রেসে যাচ্ছ?

যতীন ঘাড় নেড়ে বললে—আর-একটা নতুন নভেল ছাপাচ্ছি। এই নিয়ে বারোটা হল।

—কী-কী নতুন বই তোমার কাছে আছে?

—ইংরেজি নভেল তো? অলডাস হাক্সলি আছে—

—হাক্সলি-র কী বই আছে?

—সেট—

—আর কী আছে?

—ডি.এইচ. লরেন্সয়ের বইগুলো আছে—

—ক-খানা?

—সাত-আট খানা নভেল—

—কবিতা?

—না, লরেন্সয়ের কবিতা রাখিনি কিছু; কোনও কবিতাই রাখিনি। কবিতা লিখিও না, পড়িও না—মাঝে-মাঝে কবিতার বই দু-একখানা বের করি—

—উপন্যাস আর কী আছে?

—জয়েস আছে।

—আর?

—আর, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌—মার্সেল প্রুস্ত ... এই সব—

—আজ চলে যাচ্ছি—

—কোথায়?

—দেশে।

—কেন?

—কলকাতায় আর পোষাল না—

—টুইশনটা আমাকে দিয়ে যাও—

—টুইশন নেই আর—

—ছিল না একটা?

—সেটার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে—

—পুজোর আগেই ফুরুল?

—ছেলেটি বিলেত যাচ্ছে—

—বি.এ. না দিয়েই—

—তিনবার বি.এ. ফেল করল—

—বিলেত গিয়ে কী করবে?

—হয়তো অক্সফোর্ডয়ের বি.এ. পাস করে আসবে—

যতীন চশমা খুলে মুছতে-মুছতে বললে—যাক, আমি তো মুন্সেফ হয়ে গেছি—না হলে কী সমস্যায়ই যে পড়তে হত! কলকাতার সেকেন্ড-ক্লাস এম.এ.—বিলেত যাবারও পয়সা নেই। নভেল লিখে মানুষ খেয়ে বাঁচতে পারে না। অবিশ্যি, মুন্সেফিতে পাকা হতে দেরি লাগবে। সেই আট মাস আগে ঈশ্বরগঞ্জে দিয়েছিল—শুনেছি, সেখানকার মুন্সেফ কোর্টও উঠে গেছে—বোধ হয়, আসছে জানুয়ারি মাসে কোথাও পোস্ট করবে—

—এক-একখানা নভেলে কত দেয় তোমাকে?